সূচিপত্র

Section A: Conceptual Issues

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০১: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিচিতি	
০১	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	০২
০২	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব	০৩
০৩	আন্তর্জাতিক রাজনীতি	০৪
০৪	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য	০৫
০৫	আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ধারণা	০৭
০৬	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি	০৭
০৭	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেল	১১
	অধ্যায়-০২: বিশ্বের কর্মকসমূহ	
০৮	কর্মকের ধারণা	১৯
০৯	রাষ্ট্র	২২
১০	আধুনিক রাষ্ট্র	২৪
১১	বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা	২৫
১২	রাষ্ট্রের শ্রেণিবিভাগ	২৭
১৩	রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য	৩৪
১৪	সার্বভৌমত্ব	৩৫
১৫	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৭
১৬	বহুজাতিক সংস্থা	৪১
	অধ্যায়-০৩: ক্ষমতা ও নিরাপত্তা	
১৭	শক্তি বা ক্ষমতা	৪৫
১৮	জাতীয় শক্তি	৪৬
১৯	জাতীয় স্বার্থ	৪৭
২০	শক্তিসাম্য	৪৮
২১	নিরাপত্তা ও যৌথ নিরাপত্তা	৪৯
২২	ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক	৫২
২৩	দাঁতাত	৫২
২৪	আন্তর্জাতিক অপরাধ	৫৩
২৫	আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মানবিক হস্তক্ষেপ	৫৫
২৬	নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ	৫৬
২৭	কোয়াড	৬০

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮	আলোচিত বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম	৬১
২৯	ভূ-রাজনীতি	৬৫
৩০	ভূ-অর্থনীতি	৬৬
৩১	বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ	৬৬
৩২	অভিবাসী, শরণার্থী, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও জেনেভা কনভেনশন	৭১
৩৩	Ethnic Conflict ও Interstate Conflict	৭৩
৩৪	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)	৭৪
	অধ্যায়-০৪: প্রধান ধারণা ও মতবাদসমূহ	
৩৫	জাতীয়তাবাদ	৭৮
৩৬	আন্তর্জাতিকতাবাদ	৮০
৩৭	সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সাম্রাজ্যবাদ	৮১
৩৮	উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ	৮৩
৩৯	আধিপত্যবাদ	৮৬
৪০	উত্তর আধুনিকতাবাদ	৮৭
৪১	বিশ্বায়ন	৮৮
৪২	অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন	৯১
৪৩	গ্লোকাল	৯২
৪৪	নয়া বিশ্বব্যবস্থা	৯২
৪৫	লোকরঞ্জনবাদ	৯৩
৪৬	শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ	৯৪
৪৭	নব্য নাৎসিবাদ	৯৪
৪৮	ফ্যাসিবাদ	৯৪
৪৯	সন্ত্রাসবাদ	৯৫
৫০	ইসলামোফোবিয়া	৯৬
৫১	একপাক্ষিকতা, দ্বি-পাক্ষিকতা ও বহুপাক্ষিকতা	৯৭
৫২	কর্তৃত্ববাদ	৯৮
৫৩	শিল্প বিপ্লব	৯৯

সূচিপত্র

Section A : Conceptual Issues

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৫: বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি	
৫৪	পররাষ্ট্রনীতি	১০৪
৫৫	কূটনীতি	১০৭
৫৬	কূটনীতিতে নেগোসিয়েশন, পজিশন ও ইন্টারেস্ট	১০৮
৫৭	বিভিন্ন প্রকার কূটনীতি	১০৯
৫৮	কূটনীতিকের ধারণা, সংজ্ঞা, কাজ, সুবিধা ও অবসান	১১৯
৫৯	বাণিজ্যিক দূত সংক্রান্ত আইন	১২২
৬০	বিভিন্ন কূটনৈতিক মতবাদ	১২২
৬১	পররাষ্ট্রনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১২৫
৬২	চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক	১২৫
	অধ্যায়-০৬: আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	
৬৩	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১২৯
৬৪	বিভিন্ন ধরনের কর	১৩৫
৬৫	নব্য অর্থনৈতিক ধারণা	১৩৬
৬৬	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	১৩৮
৬৭	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	১৩৯
৬৮	মেধাস্বত্ব	১৪২
৬৯	বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক মন্দা	১৪৩
৭০	সাহায্য, ঋণ ও সরকারি অর্থব্যবস্থা	১৪৭
৭১	আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিকীকরণ	১৫১
৭২	আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি	১৫২
৭৩	উত্তর-দক্ষিণ বৈষম্য	১৫৭
৭৪	বৈশ্বিক দারিদ্র্য	১৫৮
৭৫	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য	১৫৯

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৭: বৈশ্বিক পরিবেশ	
৭৬	পরিবেশ ও প্রতিবেশ	১৬৩
৭৭	জলবায়ু, জলবায়ু শরণার্থী ও জলবায়ু কূটনীতি	১৬৪
৭৮	পরিবেশগত ইস্যু	১৬৮
৭৯	জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ	১৬৯
৮০	পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ	১৭৬
৮১	পরিবেশ বিষয়ক কনভেনশন	১৭৭
৮২	পরিবেশবাদী সংগঠন	১৭৮
৮৩	পরিবেশ বিষয়ক তহবিল	১৭৮
৮৪	পরিবেশ বিষয়ক পদক	১৭৯
৮৫	কার্বন বাণিজ্য	১৭৯
	Section C: Problem-Solving	
৮৬	বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট: বাংলাদেশের করণীয়	১৮৬
৮৭	ক্লাইমেট জাস্টিস ও বাংলাদেশ	১৮৮
৮৮	বাংলাদেশের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল	১৯০
৮৯	শ্রম অধিকার ও গণতন্ত্র: বাংলাদেশের বৈশ্বিক সম্ভাবনা	১৯৪
৯০	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বাংলাদেশ	১৯৬
৯১	রোহিঙ্গা শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন	১৯৮
৯২	বাংলাদেশের LDC উত্তরণ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	২০০
৯৩	মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থান সংকট: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	২০১
৯৪	আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের কৌশলগত অংশীদারত্ব বৃদ্ধি	২০৩
৯৫	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা	২০৫
৯৬	সোশ্যাল মিডিয়া কূটনীতি	২০৭

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

Section A: Conceptual Issues
Section C: Problem-solving

ক্রমিক নং	বিষয়	৫০তম	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
০১.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিচিতি	২	১	২	-	-	-	১	১	১	১	-	-	৯
০২.	বিশ্বের কর্মকসমূহ	-	১	-	২	২	৪	-	২	৪	১	৩	৪	২৩
০৩.	ক্ষমতা ও নিরাপত্তা	২	১	২	৩	৩	২	২	১	৪	১	২	৪	২৭
০৪.	প্রধান ধারণা ও মতবাদসমূহ	১	১	২	-	২	২	১	১	-	-	১	১	১২
০৫.	বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি	১	১	২	-	১	২	১	২	-	২	-	১	১৩
০৬.	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	২	১	১	১	১	-	২	২	১	৩	২	১	১৭
০৭.	বৈশ্বিক পরিবেশ	১	২	১	১	-	-	১	১	১	১	-	-	৯
০৮.	সমস্যা সমাধান	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১২
	মোট	১০	৯	১১	৮	১০	১১	৯	১১	১২	১০	৯	১২	১২২

অধ্যায় ০৪

প্রধান ধারণা ও মতবাদসমূহ
(Major Ideas and Ideologies)

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'Post-structuralism' এবং 'Deconstructionism' সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [৫০তম বিসিএস]
০২. অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism) বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৭তম বিসিএস]
০৩. 'গ্লোকাল' বলতে কী বোঝায়? [৪৬তম বিসিএস]
০৪. 'ট্রুমান মতবাদ (১৯৭৪)' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। [৪৬তম বিসিএস]
০৫. 'খাদ্য জাতীয়তাবাদ' (Food Nationalism) বলতে কী বোঝায়? কেন এর উদ্ভব হয়? [৪৪তম বিসিএস]
০৬. বহুপাক্ষিকতা (Multilateralism) মানে কী? বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কি এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে? [৪৪তম বিসিএস]
০৭. "নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
০৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ধারণাটি বিবৃত করুন। [৪৩তম বিসিএস]
০৯. ইসলামোফোবিয়া ধারণাটি সম্পর্কে লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
১০. চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]
১১. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি (Driving forces of Globalization) গুলো কী? [৩৬ ও ৩৫তম বিসিএস]
১২. সন্ত্রাসবাদ কী? "মুসলিম বিশ্ব সন্ত্রাসের শিকার"-এ বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? ব্যাখ্যা দিন। [৩৪তম বিসিএস]
১৩. উপনিবেশবাদ এবং নব্য-উপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৪তম বিসিএস]
১৪. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী? [৩০তম বিসিএস]
১৫. বিশ্বায়ন সুযোগ (Opportunities) এবং আশঙ্কার (Threats) সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।"- এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]
১৬. 'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]
১৭. বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন। [২৪তম বিসিএস]
১৮. আপনি কি মনে করেন যে আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্তরায়? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। [১৩তম বিসিএস]
১৯. টীকা লিখুন: (ক) বিশ্বায়ন (Globalization) [৩৪ ও ৩২তম বিসিএস]
(খ) নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ [১১তম বিসিএস]

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয়তাবাদ বলতে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিশেষ ঐক্যানুভূতিকে বোঝায় যার দ্বারা এর অন্তর্গত জনসমষ্টিকে বাকি মানব সমাজ থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। ১৭৭০ দশকের শেষের দিকে Johann Gottfried von Herder 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

- **হ্যান্স কোঁ বলেন,** 'Nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness.' অর্থাৎ 'জাতীয়তাবাদ প্রথম ও সর্বাগ্রে এক মানসিক অবস্থা, এক বিশেষ চেতনামূলক সৃষ্টিস্বরূপ।'
- **নর্মান প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন বলেন,** 'জাতীয়তাবাদ দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ বিশেষ। একটি জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পর্কিত আদর্শবাদ, আর অন্যটি জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ আদর্শবাদকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপদান।'

সুতরাং বলা যায়, জাতীয়তাবাদ মূলত এক বিশেষ ধরনের চেতনা। কোনো জনসমাজ রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। নিজেদের মধ্যে একাত্মবোধ ও অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্পর্ক

জাতীয়তাবাদ যেখানে নির্দিষ্ট কোনো জাতির কল্যাণ, মর্যাদা ও সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করে, আন্তর্জাতিকতাবাদ সেখানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানব জাতির চিন্তায় মগ্ন। উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী। কিন্তু সুস্থ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী নয়। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ একে অপরের পরিপূরক। আন্তর্জাতিকতাবাদে জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হয় না। আন্তর্জাতিকতাবাদ সকল জাতির স্বকীয়তা বজায় রেখে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদ বহুলাংশে আন্তর্জাতিকতাবাদে রূপ লাভ করেছে। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনাও সম্প্রসারিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য

বিষয়বস্তু	জাতীয়তাবাদ	আন্তর্জাতিকতাবাদ
১. সংজ্ঞা	জাতীয়তাবাদ হলো একটি মানসিক চেতনা যার ফলে এক জাতি অন্য জাতি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন যা বৈষম্য দূর করে বিশ্বের সকল মানুষকে সমান ভাবতে সাহায্য করে।
২. গুরুত্ব	জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে।	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে।
৩. সাম্রাজ্যবাদ	উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলাফল হলো সাম্রাজ্যবাদী চেতনা।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে।
৪. সভ্যতার বিকাশ	জাতীয়তাবাদ সভ্যতা বিকাশে প্রতিবন্ধকস্বরূপ।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মূল ভিত্তি।
৫. গণতন্ত্রের বিকাশ	জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, জাতীয়তাবাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নয়।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী।
৬. বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি	জাতীয়তাবাদ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরোধী।	আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণার প্রবর্তন করেছে।
৭. সংস্কৃতির বিনিময়	জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকে বলে সংস্কৃতির বিনিময়ে পথ রুদ্ধ থাকে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত করে।
৮. দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ	জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের উদ্রেক করে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপন করে।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) ও নয়া সাম্রাজ্যবাদ (Neo-Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি কোনো নতুন ধারণা নয়। Imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ হলো সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। অপর রাষ্ট্র দখল করে বা জয় করে, সেই রাষ্ট্রের মানুষকে জোর করে বিদেশি শাসনাধীনে আনা এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের শোষণ করাই সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য।

সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা

সাম্রাজ্যবাদ একটি বহু নিন্দিত ও বিকৃত ধারণা হলেও এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা মোটেই সহজ নয়। কারণ এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

- **মরগ্যানথু বলেন,** 'কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ সীমানার বাইরে অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।'
- **চার্লস হজেজ এর মতে,** 'সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি দেশ কর্তৃক অন্য কোনো দেশের ওপর প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ।'
- **চার্লস বেয়ার্ড বলেন,** 'সাম্রাজ্যবাদ হলো কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করা এবং দখলকৃত ভূ-খণ্ডের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা।'

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্বের অর্ধেক ভূখণ্ড এদের অধীন ছিল। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তর। আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রাণকেন্দ্র।

৯. **জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসার:** জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে আধুনিক যুগের উদ্ভব ও বিকাশ লাভ হয়। কিন্তু এ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একান্তভাবেই ধনী দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ সময়ে দরিদ্র বা অনুন্নত দেশগুলোতে কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলেও তা বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া হতো না। কিন্তু উত্তর আধুনিকতাবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে বাধা দানকারী উপাদানগুলো ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে আসছে। উত্তর আধুনিক যুগে এমন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যা আগের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করে পরিচালনা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এখানে এখন ধনী-গরিব সকল রাষ্ট্র সমানভাবে বিশ্বায়নের সুবিধাকে কাজে লাগাতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা কোনোভাবেই প্রতিহত করার কোনো সুযোগ নেই।

উত্তর-কাঠামোবাদ (Post-Structuralism)

উত্তর কাঠামোবাদ হলো উত্তর আধুনিকতাবাদের দার্শনিক বা তাত্ত্বিক ভিত্তি। এর প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে Michel Foucault এবং Jacques Derrida বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ তত্ত্বানুসারে পৃথিবীর কোনো কিছুরই একটিমাত্র নির্দিষ্ট বা চূড়ান্ত অর্থ নেই। মানুষের ভাষা, সমাজ এবং জ্ঞান সবসময় পরিবর্তনশীল। কোনো শব্দ বা বিষয়ের অর্থ- ব্যক্তি, সময় এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮০ এর দশকে যখন আফগান মুজাহিদীনরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তখন পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে তারা ছিল 'Freedom Fighters' (স্বাধীনতা সংগ্রামী)। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান তাদের হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এখানে 'মুজাহিদীন' শব্দের অর্থ ছিল 'বীর'। কিন্তু ২০০১ পরবর্তী সময় সেই একই ব্যক্তিরা বা তাদের উত্তরসূরিরা যখন মার্কিন নীতির বিরোধিতা শুরু করল, তখন পশ্চিমা মিডিয়ায় তাদের পরিচয় বদলে হয়ে গেল 'Terrorists' (সন্ত্রাসী)। এখানে ব্যক্তিরা একই আছেন, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং স্বার্থ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের প্রতি ব্যবহৃত ভাষা বদলে গেছে। একই ভাবে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটে একপক্ষ যখন কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী বলছে, অন্যপক্ষ তাদের বলছে প্রতিরোধ যোদ্ধা। এখানে সত্য কী তা নির্ভর করছে কার Narrative শোনা হচ্ছে তার ওপর। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যার ক্ষমতা বেশি, তার দেওয়া সংজ্ঞাই বিশ্বজুড়ে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিনির্মাণবাদ (Deconstructionism)

Deconstructionism এর মূল প্রবর্তক হলেন Jacques Derrida। Deconstructionism হলো একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো পাঠ্য, বক্তব্য বা ধারণার ভেতরে নিহিত গোপন অর্থ অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও পক্ষপাত উন্মোচন করা হয়, যা উত্তর-কাঠামোবাদের প্রদান প্রায়োগিক পদ্ধতি বা কৌশল। এটি প্রচলিত ধারণার ভেতরে থাকা গোপন বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য উন্মোচন করে।

উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিশালী দেশগুলো (যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটো) প্রায়ই অন্য কোনো দেশে সামরিক অভিযান চালানোর সময় মানবিক হস্তক্ষেপ বা গণতন্ত্র রক্ষার দোহাই দেয়। বি-বিনির্মাণবাদ এই শব্দগুলোকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখায় যে এর অর্থ কতটা ফাঁপা। ইরান,লিবিয়া বা ইরাক সংকটে আপাত বয়ান হচ্ছে 'আমরা এই দেশে আক্রমণ করছি ওখানকার স্বৈরশাসককে হটিয়ে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে।' বি-বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিতে প্রশ্ন তোলা হয়, যদি উদ্দেশ্য কেবলই মানবিকতা হয়, তবে কেন একই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়া অন্য কোনো দেশে (যেখানে তেল নেই বা যারা মিত্র) আক্রমণ করা হয় না? এখানে মানবিকতা শব্দটি আসলে একটি মুখোশ। বিনির্মাণবাদ দেখায় যে, মানবিকতার আড়ালে আসলে তেল সম্পদ বা ভূ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ, একই শব্দের অর্থ এক জায়গায় আশীর্বাদ আর অন্য জায়গায় আগ্রাসন। একইভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (War on Terror)-এ যখন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ড্রোন হামলায় নির্দোষ বেসামরিক মানুষ মারে, সেটাকে বলা হয় 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' (Collateral Damage), আর যখন কোনো গোষ্ঠী একই কাজ করে, তখন সেটা হয় 'সন্ত্রাসবাদ'। বিনির্মাণবাদ দেখায় যে, 'সন্ত্রাসবাদ' কোনো স্থির সত্য নয়; বরং এটি একটি রাজনৈতিক তকমা যা ক্ষমতার পাল্লা দিয়ে নির্ধারিত হয়।

বিশ্বায়ন (Globalization)

সমাজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। বিশ্বায়নকে নানাভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করা যায়। বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য। এটি এমন এক বিশ্বের ধারণাকে তুলে ধরে যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানা বা জাতীয় সীমারেখার কোনো ভূমিকা থাকবে না। অর্থাৎ The world is open and free for all ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। যাই হোক, বিশ্বায়ন সম্পর্কে কয়েকজন তাত্ত্বিকের মত ও সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

- **বিশ্বায়নের প্রথম তাত্ত্বিক রবার্টসনের মতে,** 'The compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as whole.' (বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।)
- **সমাজ বিজ্ঞানী মার্টিন আলব্রো এবং এলিজাবেথ কিং এর মতে,** 'বিশ্বায়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে একটি একক বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ।'

- **আন্তর্জাতিক সাহায্য হ্রাস:** আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতাই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর চালিকাশক্তি। অথচ প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এসব রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট হতে যে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে তা নিতান্তই নগণ্য। যেটুকু সাহায্য আসছে তা দাতাদের পরামর্শ মতোই ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে যথার্থ ও কার্যকর ফল লাভে তারা ব্যর্থ হচ্ছে।
- **সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সম্প্রসারণ:** একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সন্ত্রাসবাদের কালো থাবা গোটা বিশ্বব্যাপী এক ভয়ংকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বলা যেতে পারে বিশ্বায়নেরই পরোক্ষ ফল এ সন্ত্রাসবাদ।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ স্বীকার করেছেন, বিশ্বায়ন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে না। বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবেশের শুদ্ধতা এবং অর্থনীতির স্থিরতা বজায় রাখতে পারছে না। তাঁর মতে, বিশ্বায়নের গতি রোধ করা সম্ভব নয়। মূল সমস্যা বিশ্বায়ন নয়। মূল সমস্যা হলো, যে উপায়ে বিশ্বায়ন পরিচালিত হচ্ছে তাই। তাঁর মতে, মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বায়নকে পরিচালিত করতে হবে।

ডি-গ্লোবালাইজেশন

ডি-গ্লোবালাইজেশন (De-Globalization) এমন একটি প্রক্রিয়া যা গ্লোবালাইজেশনের বিপরীত। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা হ্রাস পায়। ডিগ্লোবালাইজেশনের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাধা বৃদ্ধি পায়, এবং বিভিন্ন দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে চায়।

ডি-গ্লোবালাইজেশন সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে ঘটে:

- **অর্থনৈতিক সংকট:** একটি অর্থনৈতিক সংকট বা মন্দার সময় দেশগুলি তাদের নিজস্ব অর্থনীতি রক্ষার জন্য সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।
- **রাজনৈতিক পরিবর্তন:** জাতীয়তাবাদী নীতির উত্থান।
- **বাণিজ্যিক সংঘাত:** দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ বৃদ্ধি পায়।
- **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ:** স্থানীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা।
- **প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা:** সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি।

ডিগ্লোবালাইজেশনের ফলে স্থানীয় উৎপাদন এবং স্থানীয় শিল্পের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

বর্তমান বিশ্বের দেশগুলো ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে বিভক্ত হলেও অর্থনৈতিকভাবে তারা একে অপরের পরিপূরক। এই যে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির পারস্পরিক মিলন ও নির্ভরশীলতা-তাকেই বলা হয় অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। এটি মূলত মুক্তবাজার অর্থনীতি ও উদারীকরণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নিচে এর প্রধান দিকগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রধান দিকসমূহ

১. **মুক্ত বাণিজ্য:** অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো মুক্ত বাণিজ্য। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ট্যারিফ বা শুল্ক এবং অন্যান্য আমদানিকৃত বাধা দূর করা হয়। ফলে একটি রাষ্ট্র তার উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের যেকোনো দেশের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এই মুক্ত বাণিজ্য নিশ্চিত করতে কাজ করে, যার ফলে ভোক্তারা স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পায়।

২. **বৈদেশিক বিনিয়োগ:** বিশ্বায়নের ফলে পুঁজি বা মূলধনের প্রবাহ এক দেশ থেকে অন্য দেশে অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে। উন্নত বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো (MNCs) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) করে থাকে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেমন নতুন কলকারখানা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি উন্নত দেশগুলো সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটি বিশ্বব্যাপী সম্পদের বণ্টন ও শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে।

৩. **শ্রমের বিশ্বায়ন:** পুঁজি ও পণ্যের পাশাপাশি শ্রমের বিশ্বায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে মানুষ জীবিকার তাগিদে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। দক্ষ প্রকৌশলী, চিকিৎসক থেকে শুরু করে অদক্ষ শ্রমিক সবার জন্যই এখন আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উন্মুক্ত। এর ফলে একদিকে যেমন শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে, অন্যদিকে প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। এটি বিশ্বজুড়ে মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৪. **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা:** তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিপ্লব অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে সবচেয়ে বেশি গতিশীল করেছে। ইন্টারনেট, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন মুহূর্তেই কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য সম্পন্ন হচ্ছে। ভৌগোলিক দূরত্ব এখন আর ব্যাবসার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। প্রযুক্তির কারণেই আজ বিশ্বের এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এটি বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছে।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে একটি বিশাল 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বগ্রামে পরিণত করেছে। এটি যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, তেমনি এর ফলে অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশগুলো বড় অর্থনীতির চাপে পড়ার ঝুঁকিও থাকে। তবে সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে এই বিশ্বায়নের সুফলকে কাজে লাগিয়ে যেকোনো দেশ নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে।

- বিরোধী রাজনীতিকদের ওপর নজরদারির জন্য গোয়েন্দা সংস্থার ব্যবহার;
- অনুগত ব্যবসায়িদের পুরস্কার, অবাধ্য ব্যবসায়িদের শাস্তি;
- বিচারব্যবস্থা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা;
- শুধু এক পক্ষের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ;
- ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানো;
- বিরোধী রাজনীতিকদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার।

Conspiracy Theory (ষড়যন্ত্র তত্ত্ব)

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব (Conspiracy Theory) হলো এমন একটি ধারণা বা বিশ্বাস যা কোনো ঘটনার বা পরিস্থিতির পিছনে শক্তিশালী গ্রুপ বা সংগঠনের ভূমিকা থাকার দাবি করে। কোনো দুর্ঘটনাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে কল্পনাপ্রসূত ভাবে রহস্যময় করে তোলার প্রবণতাকেই কন্সপিরেসি থিওরি বলে। এই থিওরি একদল লোককে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে এবং বেশিরভাগ সময়েই সমাজে পাকাপোক্ত ভাবে গেড়ে বসে। কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব জনপ্রিয় কোনো ব্যক্তি, প্রভাবশালী অভিনেতা বা রাজনৈতিক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রথমে সমাজে অবতারণা করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে সেটি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেটিকে একসময় সত্য বলে মনে করে। ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো সাধারণত বিশ্বাস করে যে, একটি গোষ্ঠী বা শক্তিশালী সংগঠন কোনো ঘটনা বা সংকটকে প্রভাবিত করছে বা নিয়ন্ত্রণ করছে যাতে তাদের নিজেদের লাভ বা উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি গল্প পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, বার বার দেখা বিষয়গুলো মানুষ বেশি বিশ্বাস করে।

ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কিছু উদাহরণ

- ২০১১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ইসরায়েল বা মার্কিন সরকারই পরিকল্পনা করেছিল। যদিও প্রমাণ এবং তদন্তের মাধ্যমে এটি অস্বীকার করা হয়েছে।
- অনেকে মনে করেন যে, ১৯৬৯ সালে অ্যাপেলো ১১ চাঁদে পৌঁছানোর ঘটনা আসলে এক ধরনের কৃত্রিম নাটক ছিল যার পিছনে মার্কিন সরকার বা নাসার ষড়যন্ত্র ছিল।
- COVID-19 মহামারির সূত্রপাতের পরে একাধিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব উঠে আসে, যেখানে বলা হয় যে ভাইরাসটি মানুষের তৈরি এবং চীনের হুবেই প্রদেশের Wuhan Institute of Virology নামক গবেষণাগারে তৈরি হয়েছে বা সেখান থেকে ছড়িয়েছে।

শিল্প বিপ্লব

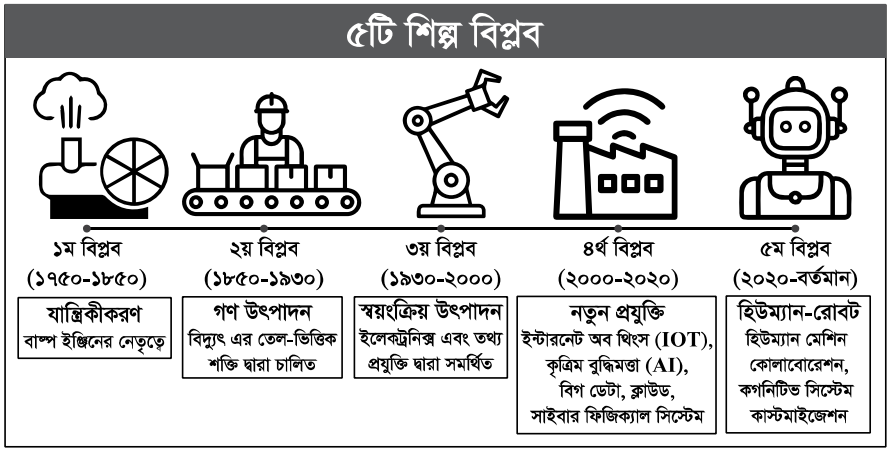

প্রতিটি শিল্প বিপ্লবই কিছু না কিছু নতুনত্ব নিয়ে এসে বিশ্ব সভ্যতার পট পরিবর্তন করেছে। যেমন: প্রথম শিল্প বিপ্লব ১৮ শতকে-বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ১৯ শতকে- বিদ্যুতের আবিষ্কার। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব ২০ শতকে- কম্পিউটার আবিষ্কার। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ২১ শতকে- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংকস (IOT), ব্লকচেইন, 3D প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং অন্যান্য অগ্রগতির সংমিশ্রণ।

বর্তমানে আলোচনায় এসেছে পঞ্চম শিল্প বিপ্লব বা 5IR (Fifth Industrial Revolution)। পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের মূল ধারণা হলো মানুষ ও যন্ত্রের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক (human-machine collaboration) প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তির সাথে মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও নৈতিকতা সংযুক্ত করার প্রয়াস।

পঞ্চম শিল্প (5IR) বিপ্লবের ধারণা

পঞ্চম শিল্প বিপ্লব (5IR)-একটি 'হিউম্যান-সেন্ট্রিক টেকনোলজিক্যাল এরা'। এটা কেবল নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, বরং প্রযুক্তি ও মানবিক বোধের সহাবস্থানের বিপ্লব। যেখানে যন্ত্র শুধু কাজ করবে না, মানুষকে বুঝবে, সহমর্মিতা দেখাবে। বিশ্বের ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব কখনোই কেবল প্রযুক্তির উত্তরণ নয়, বরং সমাজ, অর্থনীতি ও মানবিকতা-এই ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের এক গতিশীল রূপান্তর। এখন আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে প্রযুক্তি আর মানুষের মধ্যে কেবল সহাবস্থান নয়, বরং সহমর্মিতার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে যেখানে যন্ত্র মানুষের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, সেখানে পঞ্চম বিপ্লব মানুষকে প্রযুক্তির 'সহযোগী' হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করছে। এই নতুন যুগের নাম-পঞ্চম শিল্প বিপ্লব বা Fifth Industrial Revolution (5IR).

পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের উপাদান

পঞ্চম শিল্প বিপ্লব মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), রোবোটিক্স, ব্লকচেইন, জেনারেটিভ এআই প্রভৃতিকে মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতার সঙ্গে সমন্বয় করার যুগ। এটি মানবিক প্রযুক্তির বিপ্লব-যেখানে যন্ত্র ও মনুষ্য শক্তি একসঙ্গে কাজ করবে, প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতাকে প্রাধান্য দেবে।

বাংলাদেশের বাস্তবতা ও 5IR-এর সম্ভাবনা

১. **বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি:** বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশই তরুণ (১৫-৩৫ বছর)। এই তরুণরা প্রযুক্তি-সচেতন, মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানের অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিযোগী। সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে এই জনশক্তি 5IR যুগে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হতে পারে।

২. **তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার 5IR-এর ভিত্তিভূমি:** 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট পৌঁছেছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এই বিস্তারকে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত করেছে। এখন দরকার এই প্রযুক্তিকে মানবিক করে তোলা-যার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে 5IR।

চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের পাশাপাশি ঝুঁকি

১. দক্ষতা ঘাটতি-প্রযুক্তির গতির সাথে মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পিছিয়ে। প্রযুক্তি জ্ঞান, সফট স্কিল ও মানবিক বোধ-এই তিনের সমন্বিত শিক্ষা প্রয়োজন।

২. মানবিক সংকটের ঝুঁকি-AI এবং রোবটিক্স যদি শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়, তবে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হতে পারে। কাজ হারানো, একাকিত্ব, তথ্যের অপব্যবহার-এসবই সম্ভাব্য ঝুঁকি।

৩. নীতিমালা ও সাইবার নিরাপত্তার অভাব-ডেটা সুরক্ষা আইন, AI ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা, রোবটের নৈতিক ব্যবহার-এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	পঞ্চম শিল্প বিপ্লব
লক্ষ্য	দক্ষতা এবং অটোমেশন	সৃজনশীলতা এবং মানবিক স্পর্শ
উদ্দেশ্য	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচন	টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ
প্রভাব	মানুষকে প্রতিস্থাপন করার প্রবণতা	মনুষ্য বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির সমন্বয়
সীমাবদ্ধতা	মানবিক বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার ভূমিকা গৌণ	ব্যয়বহুল প্রযুক্তি ও Collaboration এর অভাব

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝেন? জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো লিখুন।
০২. কর্তৃত্ববাদ কাকে বলে? কর্তৃত্ববাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
০৩. নব্য-উপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝেন? নব্য-উপনিবেশবাদের শোষণের পদ্ধতি আলোচনা করুন।
০৪. উত্তর আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
০৫. পঞ্চম শিল্প (5IR) বিপ্লব বলতে কী বোঝেন? চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের পার্থক্য আলোচনা করুন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. আধিপত্যবাদ কী? 'সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ'-ব্যাখ্যা করুন। ৪

নমুনা উত্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আধিপত্যবাদ (Hegemony) বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী বৈশ্বিক ব্যবস্থায় অন্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রভাব সাধারণত প্রত্যক্ষ দখল বা শাসনের মাধ্যমে নয়; বরং নীতিনির্ধারণে প্রভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরতা সৃষ্টি, সামরিক জোট, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শিক প্রভাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালনা করে, ফলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো কার্যত তার প্রভাববলয়ের মধ্যে পড়ে যায়। অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র বা অঞ্চলকে প্রত্যক্ষভাবে দখল করে নেয় এবং সেখানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদে উপনিবেশ স্থাপন, স্থানীয় জনগণের ওপর শাসন এবং সম্পদের সরাসরি শোষণ প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় শক্তিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় যে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

সাম্রাজ্যবাদকে আধিপত্যবাদের একটি বিশেষ ও পুরোনো রূপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তবে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদে নিয়ন্ত্রণ হয় প্রত্যক্ষ দখল ও শাসনের মাধ্যমে, আর আধিপত্যবাদে নিয়ন্ত্রণ হয় পরোক্ষ প্রভাবের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদ মূলত ঔপনিবেশিক যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যদিকে আধিপত্যবাদ আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বেশি প্রচলিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদ হলো 'কঠোর' আধিপত্যের রূপ, যেখানে শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটে। আর আধিপত্যবাদ হলো 'নরম ও কঠোর' উভয় ধরনের ক্ষমতার সমন্বয়, যেখানে অর্থনীতি, কূটনীতি, সংস্কৃতি ও সামরিক শক্তি একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যায়, সব সাম্রাজ্যবাদই আধিপত্যবাদ, কিন্তু সব আধিপত্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ নয়।

০২. পুঁজিবাদ কী? 'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর' এই বক্তব্যে আপনার মতামত দিন? ৪

নমুনা উত্তর: আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বোঝার জন্য পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি ধারণা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। একদিকে পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত মুনাফা ও বাজারনির্ভর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ সেই পুঁজিবাদেরই বিস্তৃত ও আগ্রাসী রূপ। নিচে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

পুঁজিবাদ (Capitalism): পুঁজিবাদ হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণ, সম্পদ ও পুঁজির মালিকানা ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। উৎপাদন, বিনিয়োগ, সম্পদের ব্যবহার, মূলধনের স্থানান্তর এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত মূলত মালিক শ্রেণির দ্বারাই গৃহীত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমিত থাকে এবং বাজার ব্যবস্থা ও প্রতিযোগিতাই অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism): সাম্রাজ্যবাদ বলতে একটি রাষ্ট্রের দ্বারা নিজ সীমানার বাইরে অন্য রাষ্ট্র বা জাতির ওপর রাজনৈতিক, সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্য জাতিকে শাসন ও শোষণের মাধ্যমে সুবিধা আদায় করা। অতীতে সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত ভূখণ্ড দখল ও উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ তার রূপ পরিবর্তন করেছে এবং বর্তমানে এটি সরাসরি শাসনের পরিবর্তে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হয়েছে।

'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর'-উক্তিটির বিশ্লেষণ

আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বা শেষ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পর্যায়ে পুঁজি ও উৎপাদন ব্যবস্থা কয়েকটি বৃহৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এসব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিশ্ববাজার ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ, পণ্য রপ্তানি কিংবা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের বাজার দখল করে নেয়। সস্তা শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করা হয় এবং সেই মুনাফা আবার মূল দেশে পাচার করা হয়। ফলে উপনিবেশ স্থাপন ছাড়াই অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ তার আধিপত্য বজায় রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ধারণা নয়। পুঁজিবাদের মুনাফাভিত্তিক চরিত্রই ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের পথ তৈরি করে। আধুনিক বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ আর সরাসরি দখলদারির মাধ্যমে নয়, বরং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, পুঁজি বিনিয়োগ ও বাজার দখলের মাধ্যমে কার্যকর রয়েছে। তাই যথার্থভাবেই বলা হয়-সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদেরই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত রূপ।

Section C

সমস্যা সমাধান
(Problem Solving)

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন, সুরক্ষাবাদী নীতি, কৌশলগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, পারস্য উপসাগরে চলমান সংকট এবং যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক শুল্ক (Reciprocal Tariff) আরোপ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নতুনভাবে প্রভাব ফেলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন নীতিবিশ্লেষক হিসেবে আপনি বাংলাদেশের জন্য কী কী কৌশলগত পদক্ষেপ প্রস্তাব করেন? উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর মনোনিবেশ করুন: [৫০তম বিসিএস]

(ক) বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কীভাবে গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে (Global Value Chain) তার অবস্থান পুনঃনির্ধারণ (Reposition) করতে পারে?

(খ) কী ধরনের বৈচিত্রকরণ নীতিমালা (Diversification Policy) অবলম্বন করলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে প্রাসঙ্গিক থাকা যায়?

(গ) বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিগত সংস্কার প্রয়োজন?

০২. আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে পড়া সম্মুখ সারির একটা দেশ। ধরুন, জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মহলের কাছে অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তা চাইছে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গঠিত তহবিলে (Climate Fund) প্রতিশ্রুত অর্থ পুরোপুরি প্রদান করছে না। বাংলাদেশ কিছু অনুদান ও সহায়তার আশ্বাস পাচ্ছে কিন্তু তা শর্ত সংবলিত যা দেশের চলমান উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এমতাবস্থায়- [৪৭তম বিসিএস]

(ক) দেশের দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু অভিযোজন নীতি (Climate Adaptation Policy) এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব কীভাবে সমাধান করবেন?

(খ) আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ ও কৌশলগত ঝুঁকি কীভাবে মোকাবেলা করবেন?

(গ) জলবায়ু সংক্রান্ত বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও সীমাবদ্ধতা কীভাবে বিবেচনা করা উচিত হবে?

(ঘ) প্রতিশ্রুত অর্থায়ন এবং শর্ত সংবলিত সহায়তার ক্ষেত্রে নীতি বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারে?

(ঙ) বৈশ্বিক জলবায়ু নীতি ও স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন অভিলাষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে বাংলাদেশ কীভাবে কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

০৩. এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করুন যেখানে বহির্বিশ্বের কারো অধিকারে আপনার দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামগ্রিক তথ্য রয়েছে। সকল প্রকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, আর্থিক তথ্যাদি, ব্যক্তির অবকাশ যাপন ও শখ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে হৃত। নিজস্ব তথ্যের উপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যার ফলে মানুষের জীবন এখন সহজতর, আরো উপভোগ্য এবং অন্য মানুষের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে মানুষ এখন আরো দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পারছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে- [৪৬তম বিসিএস]

(ক) আপনি কি একটি মুক্ত, স্বাধীন দেশে নাকি একটি উপাত্ত উপনিবেশে (Data Colony) বসবাস করছেন?

(খ) জীবনের কিছু সুবিধার বিনিময়ে নিজেকে এক অপরিচিত বুদ্ধিমত্তার অধীনে ভাবতে আপনার কেমন বোধ হতে পারে?

(গ) উপাত্ত বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ চ্যালেঞ্জ/দ্বন্দ্ব মোকাবেলার উপায় কী?

(ঘ) উপাত্ত-উপনিবেশে (Data Colony) পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণত কী হতে পারে?

Policy Brief Format

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
[উদাহরণ]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তারিখ: .....

শিরোনাম
[উদাহরণ]
নীতিপত্র/পরামর্শপত্র: শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যকরণে করণীয়

ঘটনার প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।

সমস্যার প্রেক্ষাপট : শুরু থেকে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে হবে।

সমস্যার প্রভাব :

সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশ :

পরিশেষে নিজের সমাপ্তি মন্তব্য তুলে ধরুন

বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট: বাংলাদেশের করণীয়

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল-ইরান সংঘাত দীর্ঘমেয়াদি হলে তা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দিতে পারে। এশিয়াসহ বিশ্বজুড়ে বেড়েছে জ্বালানি সংকট, মূল্যস্ফীতি। এ পরিপ্রেক্ষিতে-

(ক) বাংলাদেশ কী কী কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?
(খ) অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয় কী?
(গ) জ্বালানি আমদানিতে কীরূপ বৈচিত্র্য আনয়ন সম্ভব, তার যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর:

(ক) মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত যখন হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ Choke Point কে অবরুদ্ধ করে, তখন বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির জন্য কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বহুমুখী পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হবে।

- **এনার্জি ডিপ্লোম্যাসি বা জ্বালানি কূটনীতি:** বাংলাদেশকে কেবল আমদানিকারক হিসেবে নয়, বরং কৌশলগত অংশীদার হিসেবে মধ্য এশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

বৈচিত্র্যকরণের যথার্থতা

জ্বালানি খাতে এই বহুমুখীকরণের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত 'Energy Trilemma' এর সফল সমাধান। ত্রিমাত্রিক ভারসাম্য এর মাধ্যমে একই সাথে তিনটি লক্ষ্য অর্জিত হয়।

- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- **জ্বালানি সাম্যতা:** সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি পৌঁছানো।
- **পরিবেশগত স্থিতিশীলতা:** কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা।

পরিশেষে জ্বালানি খাতে বৈচিত্র্য থাকলে বিশ্ববাজারের আকস্মিক দরপতন বা দরবৃদ্ধি সরাসরি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। এটি একটি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে Shock Absorber হিসেবে কাজ করে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের মতো ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য জ্বালানি বহুমুখীকরণ কোনো সাময়িক সমাধান নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় কৌশল। আমদানির উৎস ও পথ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভৌগোলিক ঝুঁকি হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধিই হতে পারে আগামীর জ্বালানি সংকটের কার্যকর রক্ষাকবচ।

ক্লাইমেট জাস্টিস ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। অথচ কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের ভূমিকা নগণ্য। গ্লোবাল নর্থ এবং গ্লোবাল সাউথের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে-

(ক) 'ক্লাইমেট জাস্টিস' বা 'জলবায়ু ন্যায়বিচার' ধারণাটি কী?
(খ) 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' গঠনে বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর দাবি কতটুকু যৌক্তিক?
(গ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশের শহরগুলোতে যে 'Urban Crisis' তৈরি হচ্ছে তা মোকাবিলায় আপনার পরামর্শ কী?
(ঘ) অভিযোজন (Adaptation) নাকি প্রশমন (Mitigation)-বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য কোনটি বেশি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত?
(ঙ) উন্নত বিশ্ব থেকে 'ক্লাইমেট ফান্ড' আদায়ে বাংলাদেশের কূটনীতি কেন আরও জোরালো হওয়া প্রয়োজন?

নমুনা উত্তর:

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি পরিবেশগত বিপর্যয় নয়, বরং এটি একটি চরম বৈশ্বিক অসমতা। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো কার্বন নিঃসরণে নগণ্য ভূমিকা রেখেও জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, পরিবেশগত সংকটের দায় এবং ক্ষয়ক্ষতির সমাধানে নৈতিক ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত করার দাবিই হলো 'জলবায়ু ন্যায়বিচার'।

ক্লাইমেট জাস্টিস বা জলবায়ু ন্যায়বিচার

'ক্লাইমেট জাস্টিস' বা 'জলবায়ু ন্যায়বিচার' হলো এমন একটি ধারণা যা জলবায়ু পরিবর্তনকে কেবল একটি পরিবেশগত বা প্রযুক্তিগত সমস্যা হিসেবে না দেখে একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে। এর মূল ভিত্তি হলো এই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা সবচেয়ে কম দায়ী (যেমন বাংলাদেশ বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ), তারাই এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, যারা ঐতিহাসিকভাবে কার্বন নিঃসরণ করে উন্নত হয়েছে (গ্লোবাল নর্থ বা উন্নত দেশসমূহ), তারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই ধারণার প্রধান দিকগুলো হলো-

- **ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা:** উন্নত দেশগুলো শিল্পায়নের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস জমিয়েছে, তার দায় তাদেরকেই নিতে হবে।
- **সম্পদ ও সক্ষমতার বণ্টন:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোকে সেই দেশগুলোর হাতে তুলে দিতে হবে যাদের তা নেই।
- **মানবাধিকার রক্ষা:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের যে অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তা নিশ্চিত করাও জলবায়ু ন্যায়বিচারের অংশ।
- **আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায়বিচার:** বর্তমান প্রজন্মের ভোগবিলাসের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবী না পায়, সেই নিশ্চয়তা প্রদান করা।

সহজ কথায়, 'যে দূষণ করেছে, মাশুল তাকেই দিতে হবে'-এই নীতিই হলো জলবায়ু ন্যায়বিচারের মূল কথা।

(খ) বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' (Loss and Damage Fund) গঠনের দাবিটি কেবল যৌক্তিকই নয়, বরং এটি একটি অপরিহার্য মানবিক ও নৈতিক অধিকার।

ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর দাবির যৌক্তিকতা

১. **ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা (Historical Responsibility):** শিল্পোন্নত দেশগুলো (গ্লোবাল নর্থ) গত ২০০ বছর ধরে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে নিজেদের উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জীভূত গ্রিনহাউজ গ্যাসের সিংহভাগই তাদের অবদান। অন্যদিকে, বাংলাদেশ বিশ্বের মোট নিঃসরণের মাত্র ০.৪৮% এরও কম দায়ী হয়েও এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করছে। তাই 'দূষণকারী অর্থ প্রদান করবে' (Polluter Pays Principle) নীতি অনুযায়ী এই ফান্ডের দাবি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

শ্রম অধিকার ও গণতন্ত্র: বাংলাদেশের বৈশ্বিক সম্ভাবনা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রম অধিকার এবং সুষ্ঠু গণতন্ত্রকে অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস বাণিজ্য সুবিধা ধরে রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায়-

ক. শ্রম অধিকার সুরক্ষা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?
খ. আন্তর্জাতিক শ্রমমান মেনে চলা বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে কী ভূমিকা রাখে?
গ. গণতান্ত্রিক চর্চা জোরদার হলে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগীদের আস্থায় কী প্রভাব পড়তে পারে?
ঘ. শ্রমিকবান্ধব ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের বৈশ্বিক অবস্থান কীভাবে রূপান্তরিত হতে পারে?

নমুনা উত্তর:

ক. যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) পক্ষ থেকে শ্রম অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) জন্য একটি বড় সুযোগ।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা

১. **আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ইউরোপীয় ইউনিয়নের GSP Plus সুবিধা পেতে হলে একটি দেশকে শ্রম অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো মেনে চলতে হয়। শ্রম পরিবেশ উন্নত হলে বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ে। শুল্কমুক্ত সুবিধা বজায় থাকে, যা রপ্তানি আয়ের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। পশ্চিমা ক্রেতারা নৈতিকভাবে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি বেশি আগ্রহী হন।

২. **উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি:** যখন একজন শ্রমিক ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা পান, তখন তার কাজের প্রতি একাগ্রতা বাড়ে। কর্মপরিবেশ ভালো হলে শ্রমিকরা ঘনঘন চাকরি পরিবর্তন করেন না, যা প্রশিক্ষিত জনবল ধরে রাখতে সাহায্য করে। মানসিকভাবে সন্তুষ্ট শ্রমিকরা তুলনামূলক কম ত্রুটিযুক্ত পণ্য উৎপাদন করেন, যা কারখানার সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়।

৩. **সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ:** যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলো বর্তমানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ESG (Environmental, Social, and Governance) কমপ্লায়েন্সকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। শ্রম অধিকার নিশ্চিত থাকলে বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আত্মবিশ্বাসী হয়। এটি শুধু পোশাক খাতেই নয়, বরং চামড়া, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পেও নতুন বিনিয়োগের দুয়ার খুলে দিতে পারে।

৪. **সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন:** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) অন্যতম উদ্দেশ্য হলো 'শোভন কাজ' (Decent Work)। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির (Collective Bargaining) সুযোগ থাকলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। ন্যায্য মজুরি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, যা পরোক্ষভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকেও শক্তিশালী করে।

বাংলাদেশের জন্য শ্রম অধিকার সুরক্ষা কেবল একটি আন্তর্জাতিক শর্ত নয়, বরং এটি একটি অর্থনৈতিক কৌশল। জিএসপি প্লাস সুবিধার মাধ্যমে রপ্তানি আয় ধরে রাখা এবং মার্কিন বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা–এই দুই লক্ষ্য অর্জনে শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

খ. আন্তর্জাতিক শ্রমমান মেনে চলা কেবল নৈতিক দায়বদ্ধতা নয়, বরং এটি বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের একটি শক্তিশালী কৌশল। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের পেছনে পরিবেশ ও শ্রম অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে ভূমিকা

১. **বাণিজ্য সুবিধা (GSP Plus) রক্ষা ও প্রাপ্তি:** বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি (LDC) থেকে উত্তরণ করবে। এরপর ইউরোপীয় বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখতে হলে GSP Plus অর্জন করা জরুরি। এর জন্য আইএলও (ILO) কনভেনশন অনুযায়ী ৩২টি আন্তর্জাতিক শর্ত মেনে চলতে হয়, যার অধিকাংশ শ্রম অধিকার সম্পর্কিত। এই মান বজায় থাকলে রপ্তানি বাজারে কোনো শুল্ক বাধা ছাড়াই বাংলাদেশের পণ্য প্রাধান্য পাবে।

২. **বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি:** বর্তমান বিশ্বে ক্রেতারা বা রিটেইলাররা (যেমন: H&M, Walmart, Zara) পণ্যের মানের পাশাপাশি সেটি 'এথিক্যাল সোর্সিং' বা নৈতিকভাবে উৎপাদিত কি না, তা যাচাই করে। শিশুশ্রম মুক্ত পরিবেশ, নিরাপদ কর্মস্থল এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত থাকলে আন্তর্জাতিক বাজারে 'Made in Bangladesh' একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নতুন ও প্রিমিয়াম বাজারগুলোতে (যেমন: জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া) প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে।